ধারাবাহিক রচনা

আধুনিক সমাজপটে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মাতৃভাবের অনন্যতা

সুব্রতা সেন

শ্রীশ্রীমা অপচয় একেবারে পছন্দ করতেন না, বলতেন, ''অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিত হন।'' আজকাল আমরা অনেকে অপচয়ের ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামাই না। যা পছন্দ হয় কিনে ফেলি, দরকারে না লাগলেও। তারপর সেটি অনাদরে পড়ে থেকে নষ্ট হয়। আবার যা কোনও না কোনও কাজে লাগানো যায়, তা উপেক্ষাভরে ফেলে দিই। মা এ-দুইয়েরই বিপক্ষে ছিলেন। শ্রীমায়ের ভাষায়, ''যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়। যা মানুষে খায়, তা গরুকে দিতে নেই; যা গরুতে খায়, তা কুকুরকে দিতে নেই; গরু ও কুকুরে না খেলে পুকুরে ফেললে মাছ খায়—তবু নষ্ট করতে নেই।''[৩৮]

অনায়াসে কেনা আর অনাদরে নষ্ট করার পিছনে একটা অস্থির, অসন্তুষ্ট, অবিবেচক, অহংসর্বস্ব মন আছে, যা কেবল নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করেই সংসারে জিততে চায়। এ-মনের চিকিৎসা ভারি কঠিন। কারণ জিনিস কেনা আর নষ্ট করাতেই এর শেষ নয়। জীবনের সর্বব্যাপারে কী পাইনি তার হিসাব করতে করতে চরমে মানুষটি একটি মনোরোগী হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রে সন্তোষকে 'অমৃত' বলা হয়েছে। সন্তোষ-অমৃত পান করলে মানুষ তৃপ্ত ও চরিতার্থ বোধ করে। মা-ও বলেছেন, ''সন্তোষের সমান ধন নেই।'' এ-জগতে আমার চেয়ে অনেকে সবদিক দিয়ে খারাপ আছে তবুও তো তারা সর্বদা বিক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ নয়! একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, দোষদর্শী, নিন্দুক ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ যতই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং গুণবান হোক না কেন মানুষ তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমরা যদি নিজেদের অহংকার একটু কমিয়ে আমাদের প্রতি মানুষের আচরণের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে আর মনের চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় না। শ্রীশ্রীমার বিড়ম্বনাপূর্ণ সংসারজীবন এবং তাঁর ক্ষমাসুন্দর নীরব প্রতিক্রিয়ার বিষয় বারবার পড়ে ও চিন্তা করে আমরা আমাদের জীবনপথ মসৃণ করতে পারি। নিজের চেষ্টার সঙ্গে মায়ের চরণে আকুল প্রার্থনা করতে পারলে ফল ফলবেই। আমাদের বিপরীত সংস্কার দৃঢ়মূল হলে প্রার্থনাও দীর্ঘকালীন এবং নিরবচ্ছিন্ন হওয়া চাই। ধৈর্য হারালে চলবে না।

আধুনিক যুগের জটিল সামাজিক পটভূমিকায় দারিদ্র্য ও প্রায় নিরক্ষরতার আবরণ জড়িয়ে ছদ্মবেশে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। পাছে

লোকে ভীতি ও সমীহবশে কাছে না আসে তাই সকল ঐশ্বর্য গোপন করে নিষ্কাম প্রেমের মাধুর্যে এবার সকলকে আপন করে নেওয়া। শুধু কি তাই, মায়ের অধিকাংশ সন্তান গৃহস্থ, তারা কীভাবে চললে সংসার ও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ হয় তা মা আদর্শ সংসারজীবন যাপন করে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর ভাষায় : ''রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন, গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!''[৩৯]

আরও লক্ষ করার বিষয়, বিচিত্র স্বভাবের, ঈর্ষান্বিত, কলহপ্রিয়, স্বার্থপর, বিকৃতমস্তিষ্ক, অর্থলোভী ও ঘোর বিষয়াসক্ত আত্মীয়স্বজন নিয়েই মা এ-জগতে সংসার পেতেছিলেন। এও তো আমাদের শিক্ষার জন্য। এর চেয়ে অনেক অনেক কম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমরা যখন দিশেহারা হয়ে পড়ি তখন নির্বাসনা মায়ের অন্তর্জ্যোতি সপ্রেমে আশ্বাস দেয়, সাহস জোগায় এবং পথের নির্দেশ দিয়ে স্বস্তি এনে দেয়।

মা গিরিশচন্দ্র ঘোষকে উপলক্ষ্য করে সকলের কাছেই আত্মপরিচয় উন্মোচিত করে বলেছেন, ''আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যজননী।''[৪০] এই সত্যজননী দিব্যমহিমায় মণ্ডিত হয়ে সকল সন্তানকে কী অনন্যসাধারণ আশ্বাসই না দিয়েছেন! ''ভয় কি, বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?''[৪১] শুধু এ-জীবনের সংকটেই নয়, পরজীবনেও সমান ভরসা জুগিয়ে বলেছেন, ''এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।''[৪২]

সত্য কাকে বলে? যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনকালেই অবাধিত অর্থাৎ একই ভাবে স্বীকৃত হয়। কাজেই সত্যজননী সহজভাবেই বলতে পেরেছেন, ''যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।'' কেবল মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া নয়, প্রতি কাজের মধ্যেও তাঁর জগজ্জননীত্ব প্রকাশিত হয়েছে। জয়রামবাটীতে তাঁকে সব শ্রেণির ভক্তদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে ভাইঝি নলিনী যখন ঘৃণাভরে বলছেন, ''মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!'' শ্রীমার অনায়াস উত্তর : ''সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?''[৪৩]

আমরা সকলেই যদি 'সত্যজননী'র সত্যিকারের সন্তান হই, তাহলে আমাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কেন? এ তো যুক্তির কথা। জগতের সকলকে আপন বলে অনুভব করার জন্য একটু সাধন করা চাই। মা বলেছেন, ''সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি, ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীন ভাব আসবে।''[৪৪] সাধন কাকে বলে তাও মা বুঝিয়ে দিয়েছেন—''সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে... নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।''[৪৫]

সন্তানদের মধ্যে অধিকারিভেদ ও রুচিভেদের তারতম্য অনুযায়ী মায়ের নির্দেশ তাঁর সর্বজনীন মাতৃত্বের পরিচয়ই তুলে ধরে। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা সংগত কি না এ-প্রসঙ্গে পূজার ব্যাপারে উৎসাহী বিমলানন্দকে

১৯০২, ৩১ আগস্টের লেখা চিঠিতে মা জানালেন, ''আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত (অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বের মানববিগ্রহ—স্বয়ং অদ্বৈত)। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'' শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনীগণ তাঁর সমাধিমগ্নতা ও দেহবুদ্ধি-বিরহিত অবস্থা একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে মা সহজভাবে এক সন্তানকে তাঁর পায়ের ব্যথার উল্লেখ করে বলছেন, ''দেহ একটি, দেহী একটি! দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন, তাই পায়ে ব্যথা। যদি এখান (হাঁটু) থেকে মন তুলে নিই, তাহলে আর বেদনা নেই।''[৪৬]

স্বামীজী একদিন মাকে বলেছিলেন, ''মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে।'' মা হেসে বললেন, ''দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!'' স্বামীজী মহাব্যস্ত হয়ে উত্তর দিচ্ছেন, ''মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?''[৪৭] অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুর পাদপদ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বর থাকেন না। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, অবতারগণের অস্তিত্ব বেদান্তের দিক দিয়ে স্বীকৃত নয়। আমাদের আদ্যাশক্তি মা যিনি এই জীবজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সকল সৃষ্টির ভিতরে ও বাইরে সমানভাবে বিরাজ করছেন তিনি কেমন অনায়াসে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, ''জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা' 'মা' শেষে দেখে। মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা!''[৪৮] সাধারণ মানুষ, 'এই সোজা কথাটা' বুঝতে পারে না। তারা দেখেছে, এই সত্যিকারের মা যেমন সকলের সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভোগ করেছেন, আশ্বাস ও আশ্রয় দিয়েছেন, তেমনই আবার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সর্বধর্মের লোকায়ত দেবদেবী, পূজার স্থান ও অনুষ্ঠানগুলিকে কী ভক্তির সঙ্গে মান্য করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ পরবে পূজাও পাঠিয়েছেন। এ-বিষয়ে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে মা সহজভাবেই বলেছেন, ''ভগবান কি আলাদা হন, বাবা।''

একমাত্র দুর্লভ অধিকারী তাঁর নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় 'আমি' বোধের গণ্ডি অতিক্রম করে যেতে পারেন। নির্বিকল্প অবস্থায় তো বেশিদিন থাকা যায় না (একমাত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণই দীর্ঘ ছয় মাস কাল এ-অবস্থায় থেকেছিলেন), সাধারণের পক্ষে এ-ভূমি অধরাই থেকে যায়। কাজেই আদ্যাশক্তির নাম, রূপ ও ক্রিয়ার জগতে তাঁর সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে জীবনধারণ করা ছাড়া জীবের আর কোনও গতি নেই।

এযুগে বিশুদ্ধ মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অতুলনীয় তপস্যায় জগন্মাতাকে মাতৃরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁর অভিন্নাত্মা শ্রীমা সারদা দেবীর মধ্যে আদ্যাশক্তির মাতৃভাব প্রকট করার জন্য ষোড়শীপূজার মাধ্যমে সেই শক্তির বোধনটুকুমাত্র করতে হয়েছিল। জগতে শিবজ্ঞানে জীবসেবা, ধর্মসমন্বয় ও মাতৃভাবের উৎকর্ষ প্রচার করার জন্য চিহ্নিত নরেন্দ্রনাথ যেদিন দীর্ঘ বিরোধিতা ও বিড়ম্বনার পরে অবশেষে কালী মানলেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কী স্বস্তি ও উল্লাস! মা কালীকে মানবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের আদ্যাশক্তিস্বরূপ নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আবার কঠোর অদ্বৈতবাদী গুরু তোতাপুরী—যিনি ঠাকুরের করতালি দিয়ে ইষ্টনাম করাকে 'কিঁউ রোটি ঠোকতে হো' বলে রীতিমতো ব্যঙ্গ করেছিলেন—নির্বিকল্প সমাধিতে অনায়াসে নিমগ্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করার পরেও কী করেই বা ঠাকুর 'মা, মা' বলে বিভোর হতেন, তা তাঁর আদৌ বোধগম্য হত না। সেই অদ্বৈতবেদান্তী তোতাপুরী রোগযন্ত্রণাকে উপলক্ষ্য করে আদ্যাশক্তি মহামায়ার

সর্বব্যাপিত্ব অনুভব করে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে সারদানন্দজী কী অনবদ্যভাবেই না তোতাপুরীজীর উপলব্ধির কথা বর্ণনা করেছেন!

পুরীজীর অদ্বৈতানুভূতির সঙ্গে জগন্মাতা মহামায়ার সর্বব্যাপিত্ব ও অচিন্ত্যমহিমার মহাসম্মেলনে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপলব্ধি—শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ—এই মহাসত্য প্রকাশিত হল। কেবল অদ্বৈতবাদ যেন অসম্পূর্ণ ছিল, শক্তিস্বীকারের ফলে তা যেন পূর্ণতা লাভ করল।

অদ্বৈতবেদান্তী তোতাপুরীজীর শক্তিস্বীকারের একটা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী সন্ন্যাসীদের শংকরাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের 'পুরী' শ্রেণিতে গণ্য করা হয়। বলা বাহুল্য এটি করা হয়েছে তোতাপুরীকে আদি পুরুষরূপে গণনা করে। পুরীজী যদি জগন্মাতাকে না মানতেন তবুও হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী সন্ন্যাসিবর্গকে দশনামী সম্প্রদায়ের 'পুরী' শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত করা হত; তাতে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ অনুভব, শক্তি-ব্রহ্ম অভেদ এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—সবই যে আদ্যাশক্তির জগল্লীলা, নরলীলা, ঈশ্বরলীলা, দেবলীলার অন্তর্গত তা কিন্তু স্বীকৃত হত না।

তবে কি বলা হবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে অদ্বৈত-তত্ত্বের চেয়ে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্য? তা কিন্তু নয়। তিনি বারবার বলে গেছেন ''যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা (Phenomenal world)। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।''[৪৯] ''যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয়—ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি।''[৫০] ''যে নিত্যেতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।... এরই নাম বিজ্ঞান।''[৫১]

নিজের বিষয়ও প্রমাণ হিসেবেই যেমন বলছেন, ''আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই।''[৫২] পাঁচিলে বড় ফাঁকের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, অবতার-পুরুষ কেমন সহজে ঐহিক ও পারমার্থিকের আস্বাদন ও সমন্বয় করে থাকেন। ঐহিক জীবনে তাঁর কী নিপুণ বাস্তববোধ ও নিখুঁত কাজকর্ম! আবার আমি বোধ চলে গিয়ে পারমার্থিক সত্তায় যখন তাঁর অবস্থান তখন সমগ্র জগৎ তো বটেই, নিজের দেহমনের অনুভবও কোথায় পড়ে থাকে।

শ্রীশ্রীমাকে সংসারে থেকে অসহায় মানুষগুলিকে দিব্য মাতৃভাবে ভরিয়ে দিয়ে পরিত্রাণের দায় গ্রহণ করতে হয়েছিল বলে বাধ্য হয়ে তাঁকে অধিকাংশ সময় মন নামিয়ে রাখতে হয়েছিল, তাও সেই মন কণ্ঠের নিচে কখনও নামত না। কঠিন কর্কটরোগের শেষপর্যায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অভিন্নসত্তা শ্রীশ্রীমাকে রীতিমতো অনুনয় করে বলেছিলেন, কলকাতার লোকগুলো (অর্থাৎ যান্ত্রিক সভ্যতায় পিষ্ট আত্মবিস্মৃত মানুষ)—যারা অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে—তাদের দেখতে।[৫৩] গৃহকোণে অবস্থান করেও আদ্যাশক্তি তাঁর পরমস্নেহের আকর্ষণে সমগ্র বিশ্বকে একটি নীড়ে পরিণত করেছিলেন। 'নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে'—এই চাপরাশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর বার্তাবহরূপে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করালেন। তার সুদূরপ্রসারী ফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

প্রদীপের আলোর নিচেই অন্ধকার থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কাছাকাছি থাকা মানুষেরা এবং আত্মীয়স্বজন শ্রীশ্রীমাকে তো বোঝেনইনি বরং নানাভাবে জ্বালাতন ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। ভাগিনেয় হৃদয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মায়ের আত্মীয়স্বজনদের শ্রীশ্রীমা একই ভাষায় সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, মায়ের ভিতরে যিনি

আছেন তিনি ফোঁস করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেউই অপরাধীকে রক্ষা করতে পারবেন না। কী করেই বা পারবেন? তাঁরাও যে আদ্যাশক্তিরই সন্তান! (শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে, ''বিষ্ণু শরীর-গ্রহণমহমীশান এব চ/ কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।'') যাঁদের উদ্দেশ্যে এই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁরা এর তাৎপর্য কিছুই বোঝেননি। ক্ষমারূপা তপস্বিনীরূপে মা আজীবন সকলের অপরাধ ক্ষমা করে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণের মধ্যে মায়ের বহিরঙ্গ রূপের বর্ণনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, ''ও সারদা, সরস্বতী।'' স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁর উদ্ভাস উভয় রূপেই—''তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা... উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি! সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।''[৫৪] উন্মত্ত হরিশকে মা নিজমূর্তিতে (বগলারূপে) বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে প্রহার করেছিলেন। সাধারণ মানুষ গভীরভাবে চিন্তা না করেই 'সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কারিণী' বলে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তব করে থাকে। কিন্তু তাঁর প্রলয়ংকর রূপ সহ্য করতে পারে কজন? মাতৃসত্তা সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে তাঁর বীরসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ 'মৃত্যুরূপা' মায়ের পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন শুধু নয়, শিষ্য সন্তানদেরও শিখিয়েছেন মৃত্যুকে ভালবাসতে। এ-মৃত্যু কেবল দৈহিক মৃত্যু নয়, এ অহং-এর বিনাশ—''চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।''

মায়ের অতিসাধারণ সন্তানরা জরা, ব্যাধি ও মরণের ভীতি জন্ম থেকে জন্মান্তরে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাদের প্রয়োজন, আর্তিহারিণী বিপদনাশিনী জননীর নিরাপদ আশ্রয়। তাদের মধ্যেও যাদের এই সংসারে অহোরাত্র পরিশ্রম করে কোনওমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়; সেবার বিনিময়ে যারা পায় সমাজের ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা—জীবন্মৃত এই মানুষেরা মায়ের কাছে পেয়েছে সন্তানের মর্যাদা ও অধিকার। মা বলেছেন, ''মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।'' মায়ের অঙ্গীকার : ''কেউ 'মা' বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।'' সৎ বা অসৎ যে-কেউ তো 'মা' বলে আসতে পারে, সুতরাং মাকে স্পষ্টভাবে জানাতে হয়েছে, ''আমি সতেরও মা, অসতেরও মা, (কাজেই) আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!''[৫৫] এই ধুলোকাদা-মাখা ছেলেগুলির জন্য মায়ের কত না চিন্তা! মা জানেন, ''মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ।''[৫৬] এই অশুদ্ধ মনই আবার শুদ্ধ হতে পারে। কাজেই এদের জন্য মা বলছেন, ''সর্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত! যখনই মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তাঁর ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে, মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।''[৫৭] ''সর্বদা তাঁর স্মরণ-মনন করে প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভু, সদ্বুদ্ধি দাও।' ''[৫৮] শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা জানেন, কলিতে অন্নগতপ্রাণ, কঠোর তপস্যার উপযোগী শরীর এযুগে নয়। ভগ্নস্বাস্থ্য সন্ন্যাসী সন্তান অব্যয়ানন্দকে ভরসা জুগিয়ে মা লিখেছিলেন, ''ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস। তপস্যার মতো ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।'' শ্রীশ্রীমার সিদ্ধান্ত : ''জপতপের দ্বারা (এবং রোগভোগের দ্বারা) কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।... বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না, তারা 'আয় রে, খা রে, নে রে'—এই করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল।''[৫৯]

এমন একজন করুণারূপিণী জননী পেয়েও আমরা কি তাঁকে ভুলে থাকব? তিনি যে আমাদের সকলকে পবিত্র মাতৃভাবের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন তা কি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে বুঝে নেব না?

শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া সর্বভূতে নিষ্কাম বাৎসল্যের আদর্শই আমাদের চরম লক্ষ্য। লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে আমাদের এগোতে হবে। প্রথমে স্নেহের গণ্ডিটা একটু বড় করি না কেন? নিজের সন্তানের মতো ভালবাসি তার সহপাঠী, খেলার সাথিদের, তারপর সন্তানের সমবয়সী সকলকে, ক্রমশ যাদের যাদের সংস্পর্শে আসি তাদেরও নিষ্কামভাবে ভালবাসতে পারলে মনে যে-স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতার সঞ্চার হয় তা-ই মুছে দেয় আমাদের নিজস্বতার গণ্ডি। আমি-বোধ আর আমার-বোধ যতই কমতে থাকে, চিত্তের প্রসার ততই বাড়তে থাকে। প্রসারিত চিত্তে শ্রীশ্রীমার উপদেশ ও অভিপ্রায়গুলি সহজেই কার্যকর হয়। তখন অপ্রিয় সত্য বলে কাউকে আঘাত দেওয়া যায় না, মিষ্টভাষী হওয়া যায় নিজের অজান্তেই। সহনশীলতা ও সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা বেড়ে যায়। পরদুঃখে কাতরতা আসে। মানুষের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। প্রথম প্রথম হয়তো লোকের দোষ চোখে পড়ে কিন্তু ক্রমে তার নিন্দা করার চেয়ে দোষের কারণগুলি খুঁজতে ইচ্ছা হয়, ফলে একটা সমবেদনার ভাব দেখা দেয়, যাতে তার গুণের দিকেও নজর পড়ে। এতে নিজের একটা মস্ত লাভ হয়। দোষদর্শনের ফলে মনে যে-বিরক্তির সঞ্চার হয় তার উপশম ঘটে। ক্রোধকে শাস্ত্রে রিপু বলা হয়েছে। বিরক্তি রিপু না হলেও তা ক্রোধের দ্বারস্বরূপ। বিরক্তি জমতে জমতে হঠাৎ একদিন ক্রোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিরক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পারলে শরীর ও মনের সুস্থতা বজায় থাকে। মা এ-জগতে নানাজনকে নানারকম কাজ দিয়েছেন। তাঁর জগৎলীলায় অসংখ্য জীবের অসংখ্য কাজ। তার মধ্যে বিচারশক্তি দিয়েছেন বলে মানুষ কীভাবে তাঁর দেওয়া কাজ কত সুন্দরভাবে করতে পারে তার তো আগ্রহ আছেই। সুতরাং জগৎলীলায় আমরা নিজেদের ভূমিকা কত ভালভাবে পালন করতে পারি সেজন্য নিরন্তর একটা প্রার্থনার ভাবে থাকতে পারলে সুবিধা হয়। চিত্ত প্রসন্ন না থাকলে প্রার্থনাও কি আন্তরিক হয়?

শ্রীশ্রীমায়ের অন্তিম উপদেশ বিশেষ মননের দাবি রাখে। আমরা সবাই জানি, মা বলেছিলেন, ''যদি শান্তি চাও কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।''[৬০]

সন্তানগণের দোষদর্শিতা কাটাবার জন্য মা যে কতরকম চেষ্টা করেছেন, নিজের উদাহরণ পর্যন্ত দিয়েছেন, সে-বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পরের দোষ না দেখা ও নিজের দোষের দিকে নজর দেওয়াকে মা এখানে শান্তিলাভের পূর্বশর্ত বলে নির্দেশ করেছেন। বলাবাহুল্য এ-শান্তি পরমা শান্তি নয়, এ-শান্তি প্রাথমিক পর্যায়ের। পরমা শান্তিকে শাস্ত্রে ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ মোক্ষের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে (গীতা ২।৭০-৭২)। সর্ববিষয়ে যিনি স্পৃহাশূন্য (নিঃস্পৃহ), যিনি মমত্ববুদ্ধি বা 'আমার' 'আমার' বোধ ত্যাগ করতে পেরেছেন (নির্মম), যিনি 'আমি ধনী' 'আমি জ্ঞানী' এই ধরনের অহংকারবর্জিত (নিরহংকার), তিনিই শান্তিলাভ করেন। প্রকৃত শান্তি

পেলে কেমন হয় তা গ্রন্থান্তরে চমৎকারভাবে জানানো হয়েছে—''ভবিষ্যৎ নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।/ বর্তমান নিমেষংতু হসন্নেবাভি-বর্ততে॥''—যিনি শান্তি পেয়েছেন তিনি ভবিষ্যতে কী হবে ভেবে অস্থির হন না, অতীতের কথা চিন্তা করেন না, বর্তমান সময়টি প্রসন্ন হাসিতে কাটান। এককথায় যিনি অনাসক্ত অথচ স্নেহসিক্ত, যাঁর সান্নিধ্যে এলে নিজের মনটি অকারণ আনন্দে ভরে ওঠে তিনিই তো শান্তিস্বরূপ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের শ্রীশ্রীমা।

মায়ের অন্তিম উপদেশের পরের অংশের দুটি ভাগ। একটি, জগতকে আপনার বলে নিতে শেখো। অন্যটি, কেউ পর নয়—জগৎ তোমার। যদিও নিজের জীবন ও উপদেশের মধ্যে এই অবস্থাপ্রাপ্তির উপায় মা বারেবারে শিখিয়েছেন; আমরাও সেসব কতবার পড়ছি, তবু জগতের চেনা-অচেনা সবাইকে একেবারে নিজের জন বলে মনে হচ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা প্রার্থনা বড় শোনেন। আমরা তাঁদের কাছে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও উপলব্ধির জন্য সর্বদা প্রার্থনা করব আর প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাব—এই জীবজগৎ এবং যা কিছু দেখছি শুনছি ভাবছি সব মা-ই হয়েছেন, মা ছাড়া আর কিছু নেই। মায়ের বিচিত্র প্রকাশ অনুভব করে বিপুল উল্লাসে তখন বলতে পারব—তাই তো! ''মা, মা, মা আমার জগৎ জুড়ে।'' শ্রীকৃষ্ণভক্ত যেমন ভক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে বলেন, ''যথা যথা নেত্র পড়ে তথা কৃষ্ণ স্ফুরে।'' মাতৃভক্ত সন্তানও শেষে তাঁর আদরিণী মাকে সর্বত্রই প্রকাশিত দেখে বলবেন,

''মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে।
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে॥
তাঁর ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে।
আলতাপরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্তকমল ফোটে॥
সেই যে আমার মা—
বিশ্বভুবন মাঝে যাঁহার নাই কো তুলনা॥''

এই অতুলনীয়া মায়ের তুলনা তো তিনি নিজেই। আমরা ধন্যাতিধন্য। পরমা জননী নির্বিচারে আমাদের সকলকে চিরকালের জন্য তাঁর অনন্ত ক্রোড়ে স্নেহাশ্রয় দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত করেছেন।✠

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

৩৮। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), পৃঃ ৩৬৭
৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৫৫
৪০। তদেব, পৃঃ ১৭০
৪১। তদেব, পৃঃ ৩০৭
৪২। তদেব, পৃঃ ৩০৯
৪৩। তদেব, পৃঃ ২৭৯
৪৪। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ৬৩ [এরপর, *মায়ের কথা*]
৪৫। তদেব, পৃঃ ১৪০-৪১
৪৬। তদেব, পৃঃ ১৭২
৪৭। তদেব, পৃঃ ১৯০
৪৮। তদেব, পৃঃ ১৯১
৪৯। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৩১৫ [এরপর, *কথামৃত*]
৫০। তদেব, পৃঃ ৩১৪
৫১। তদেব, পৃঃ ৫৩৪
৫২। *কথামৃত*, পৃঃ ২৯১
৫৩। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ১৭৩
৫৪। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *শ্রীশ্রীসারদা দেবী* (ক্যালকাটা বুক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা ১৪১৫), পৃঃ ১২৬ [এরপর, *শ্রীশ্রীসারদা দেবী*]
৫৫। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ১৬১
৫৬। তদেব, পৃঃ ২২৩
৫৭। তদেব, পৃঃ ১১৮
৫৮। তদেব, পৃঃ ২৮০
৫৯। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, পৃঃ ১৮৪
৬০। *শ্রীশ্রীসারদা দেবী*, পৃঃ ২৩৬